Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501013

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

Non-human Animals in Bengali Fiction: In Narrative and Deconstruction
বাংলা কথাসাহিত্যে মনুষ্যেতর প্রাণী: আখ্যানে বিনির্মাণে

Dr. Amit Mondal
Assistant Professor
Bengali Department, Tilka Manjhi Bhagalpur University
Bihar

Received on: 04th April 2026
Accepted on: 15th April 2026

Abstract:
The text explores the significant role of non-human animals in Bengali literature, highlighting their presence from ancient to modern times. In early Indian texts like the Rigveda, Ramayana, and Mahabharata, animals appear as sacred beings, symbols, and vehicles of gods. In pre-modern Bengali literature, animals were widely used as metaphors, similes, and symbolic representations of human qualities. The discussion explains how non-human creatures function as both central and secondary characters, contributing to literary expression through emotional and symbolic depth. Folk traditions and texts like Panchatantra and Jataka Tales also portray animals as carriers of moral lessons and human traits. In Bengali literature, works such as Charyapad and later Vaishnava and Mangal Kavyas incorporate animals to express spiritual and social ideas. Modern writers like Rabindranath Tagore, Sarat Chandra Chattopadhyay, and Bibhutibhushan Bandyopadhyay humanized animals in stories, depicting deep emotional bonds between humans and animals. Overall, the use of non-human animals — whether as characters, symbols, or metaphors — has enriched Bengali literature by expanding its thematic range, emotional appeal, and social commentary.

Key Words:
Lower Animal, Non-Human, Creature, Invertebrates, Cow, dog, Horse etc.

মূল প্রবন্ধ

ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্য ও নাটকের স্থায়ীভাব বিভাব নামে পরিচিত। এই বিভাব দুই প্রকার — আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। চারপাশের পরিবেশ ও প্রকৃতি যখন ভাবের উদ্দীপনায় সহায়কের ভূমিকা নেয়, তখন হয় উদ্দীপন বিভাব। আর থাকে কেন্দ্র করে ভাবের বিভাগ ঘটে তা আলম্বন বিভাব। অর্থাৎ কাব্য ও নাটকের চরিত্রেরা এখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। আমরা জানি সময়ের প্রেক্ষিতে চরিত্রের নীরেট বুননে সাহিত্য চিরকালীনতা লাভ করে। তবে কথাসাহিত্যিকরা সাহিত্য রচনার সময় অবলম্বিত কেন্দ্রীয় চরিত্রের

© Santiniketan Sahityapath

পাশাপাশি উদ্দীপন বিভাব রূপে পশু-পাখি অর্থাৎ না-মানুষের কথাকেও সাহিত্যের অঙ্গানে স্থান দিয়েছেন। কখনো তারা হয়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় চরিত্র, কখনো বা পার্শ্বচরিত্র। মনুষ্যেতর প্রাণীর এই মানবায়ন বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে সন্দেহ নেই। বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে এই না-মানুষের অবস্থানটি কীরকম সেটিই দেখে নেওয়া যেতে পারে।

বাংলা সাহিত্যে মনুষ্যেতর প্রাণীর অবস্থান শুধু আধুনিক সাহিত্যেই নয়, সুপ্রাচীনকাল থেকেই এদের তাৎপর্যপূর্ণ উল্লেখ ও অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ভারতীয় সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন ঋগ্বেদ্ (আনুমানিক রচনাকাল খ্রিস্ট পূর্বাব্দ ১০০০-১৫০০) গ্রন্থে গো-সম্পদের ভূমিকা ও গুরুত্বের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন দেবদেবীর মূর্তি কল্পনায় ও তাঁদের বাহন রূপে মনুষ্যেতর প্রাণীকে স্থান দেওয়া হয়েছে। যেমন — গণেশ, নৃসিংহ, মহিষাসুর, মৎস্যগন্ধা ইত্যাদি দেব-দেবীরা মানুষ ও পশুর মিলিত রূপ। আবার ইঁদুর, পেঁচা, ময়ূর, সাপ, হাঁস — এইসব মনুষ্যেতর প্রাণীরা দেব-দেবীদের বাহনরূপে স্বীকৃত। কবিরা এইসব প্রাণীর উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তাদের ধৈর্য, পর্যবেক্ষণ শক্তি, খাদ্য চয়নের কৌশল ইত্যাদির বৈশিষ্ট্যগুলি রূপক বা সাংকেতিক অর্থে প্রয়োগ করেছেন।

শুধু ভারতের প্রাচীন সাহিত্য নয়, লোককথা ও উপকথার মধ্যেও মনুষ্যেতর প্রাণীর কথা আছে। জাতক, পঞ্চতন্ত্র, বৃহৎকথা, হিতোপদেশ, রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্যে পশু-পাখি এসেছে মানুষের চরিত্রের প্রতীক ও রূপক হিসাবে। শুধু তাই নয় লোকসাহিত্যের ধারায় ও লোকসংগীতের ধারায় ভাদু, টুসু, ঝুমুর ভাটিয়ালি, ছড়া, প্রবাদ, ধাঁধায় আছে পশু-পাখির উল্লেখ। তবে পশু-পাখির ব্যবহার এসেছে, উপমা রূপক কখনো বা প্রতীকরূপে।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাপদ'এ আছে পশু-পাখি-ফল প্রকৃতির নানা বিষয়কে উপমা-রূপকের আবরণে প্রকাশ করে গভীর সাধনতত্ত্বকে প্রকাশ করার কথা। যেমন — 'দুহিল দুধ কি বেন্টে যামা অ' — এখানে বলদ ও গাভীর কথা আছে। শুধু তাই নয় — হরিণ, কুমীর (কুম্ভীর), কাছিম (দুলি) — নানা মানবেতর প্রাণীর নাম আছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে প্রবাদ-প্রবচনের মধ্য দিয়ে ভ্রমর ও কোকিল, কাক এর কথা এসেছে। যথা, "দেখিল পাকিল বেল গাছের উপরে। / আরতিল কাক তাক ভখিতে না পারে।" বৈষ্ণব সাহিত্যে উদ্দীপন বিভাব রূপে ময়ূরের নাচ, ডাহুকীর ডাক, ভ্রম, সর্প, মীন এসেছে। 'মনসামঙ্গাল' কাব্যে মনুষ্যেতর প্রাণী হিসাবে সর্প পূজার উল্লেখ আছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে সর্পসংহারক রূপে গরুড় পাখি ও ময়ূরের উল্লেখ আছে। এছাড়াও হনুমান, মাছ, হাঙ্গার, কুমীর, শ্বেত পাখির উল্লেখ আছে। তবে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর 'চণ্ডীমঙ্গাল কাব্যে' 'পশুগণের দুঃখ নিবেদন' অংশে পশুপাখিকে স্বতন্ত্র চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন যা আসলে পশুর কণ্ঠে মানুষেরই জীবনভাষ্য। আবার বাঘকেন্দ্রিক ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতির পরিচয় ফুটে উঠেছে 'রায়মঙ্গাল' কাব্যে। প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্যে পশু-পাখির উল্লেখের মধ্য দিয়ে কখনো তারা মানুষেরই প্রতীকায়িত রূপ হয়ে উঠেছে। কখনো তারা হয়ে উঠেছে সহায়ক চরিত্র।

বাংলা কথা-আখ্যান প্রাগাধুনিক যুগ থেকে বহমান হলেও অষ্টাদশ শতকে ইংরেজ আগমন ও রাজনৈতিক অধিকারলাভের পর সাংস্কৃতিক বিজয় হয়ে দেখা দিল মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। তখন গল্পরস বা কাহিনিরস পরিবেশনের সময় কথা-আখ্যানে বাস্তব জীবন কাহিনি স্থান করে নিতে শুরু করে। সেখানে ভিড় করতে থাকে 'না-মানুষেরাও'। যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরগুপ্ত 'পাঁঠা', 'তপসে'র মতো কবিতায় না-মানুষের কথাকে এনে কিঞ্চিৎ তুচ্ছ বিষয়কে অবলম্বন করে কবিতা রচনায় পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সর্বপ্রথম পশুকে চরিত্র হিসাবে স্থান দিলেন 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রবন্ধে মঙ্গালা নামক গাভীর কথা উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে।

কথাসাহিত্যের ধারায় বাংলা ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথাই গরুকে স্নেহ-মমতায় মানবায়িত করলেন তাঁর 'সুভা' নামক ছোটগল্পে। "কথা বলতে না পারা' মূক বালিকা সুভার সঙ্গো শবলা ও পিঙ্গালা নামে দুই গভীর মমত্বের সম্পর্ক গল্পটিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্পে গফুর জোলার মহেশ নামক একটি গরুর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, সন্তান স্নেহ, পেট ভরে খেতে দিতে না পারার যন্ত্রণাকে গল্পকার মানবায়িত করেছেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বুধীর বাড়ি ফেরা' গল্পে একটি গরুর দীর্ঘদিন গৃহপালিত থেকে কসাইখানায় বিক্রি করে দেওয়া, পরে সেখান থেকে পুনরায় আপন পালিত আশ্রয়ে ফিরে আসা — এই হৃদয়স্পর্শী ঘটনাটিকে গল্পকার সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। আবার 'গরু'কে কেন্দ্র করে রচিত সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'গোঘ্ন' গল্পটিতে গবাদি পশুর প্রতি স্নেহ, অপরাধবোধ ও আত্মগ্লানির চিত্র ফুটে উঠেছে। 'গোঘ্ন' অর্থাৎ গো-হত্যাকারী বা গরুকে কষ্ট দেওয়া। শব্দটি গল্পে

© Santiniketan Sahityapath

একটি গাঢ় অপরাধবোধ হিসাবে ধরা দিয়েছে। বনফুলের 'অংকের বাইরে' গল্পে 'মঙ্গালা' নামে একটি গাভীটিকে দুইমাস বয়সে মাকে হারানোর পর কীভাবে বড়ো করে তুলেছেন এবং ভালোবাসার কারণে গাভীটিকে তিনি যে বিক্রি করতে পারেন না সেকথা বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের লেখক মহবুব উল আলমের 'কোরবানী' ও সত্যেন সেনের 'লাল গরুটা' গল্পেও গরুর সঙ্গে মানুষের সখ্যের কথাকে তুলে ধরেছেন গল্পকারেরা।

পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' একটি ছাগলকে কেন্দ্র করে লেখা। জমিদার বংশলোচন বাবু ও তাঁর স্ত্রী মালিনী দেবীর দাম্পত্য কলহের মধ্যে ছাগলের মতো প্রাণীকে ব্যবহার করে এবং তার প্রতি বাৎসল্যের স্ফুরণ ঘটিয়েছেন গল্পকার।

মনুষ্যেতর প্রাণীর তালিকায় ঘোড়া সাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'লাল ঘোড়া' গল্পটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখের দাবি রাখে। লেখকের পিতার দুটি ঘোড়া ছিল — একটি কালো, অন্যটি লাল। লাল ঘোড়াটিকে কেন্দ্র করে গল্পকারের বাৎসল্য, অলৌকিকতা, প্রভুভক্তি এই গল্পে প্রাধান্য পেয়েছে। দাঙ্গাবিধ্বস্ত কলকাতা শহরের পটভূমিকায় লেখা রমেশচন্দ্র সেনের 'সাদা ঘোড়া'। দাঙ্গাবিধ্বস্ত শহরে পুলিশের গুলিতে সাদা ঘোড়ার মৃত্যু হয়। তারপর দুই সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সে শান্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। ঘোড়াকে কেন্দ্র করে লেখা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গবিন সিংয়ের ঘোড়া' গল্পটিও মমতামাখা, স্নেহস্পর্শী।

'হাতি'কে নিয়ে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গল্প 'আদরিনী'। আদরিনী হস্তিনী হওয়ার জন্য মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানোর অনুষঙ্গ এখানে এসেছে। আদরিনীর মৃত্যুর পর শোকে গৃহকর্তারও মৃত্যু হয়। পারিবারিক জীবনে স্নেহবাৎসল্যের সঙ্গে হাতির প্রতি স্নেহচিত্র এখানে উৎসারিত হয়েছে। আবার বনফুলের 'গণেশ জননী' গল্পে এক নিঃসন্তান দম্পতির উপহার পাওয়া হস্তিশাবকের ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠা এবং গণেশ (হস্তিশাবক) ও দম্পতির মান-অভিমান এখানে হৃদ্যতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সৈনিক' গল্পটিও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এটিও একটি হাতির গল্প।

গরু, ছাগল, হাতির মতোই মহিষকে নিয়ে গল্প রচনার কথা বাংলা সাহিত্যে আছে। এ প্রসঙ্গে পরশুরামের 'রাজমহিষী' নামক গল্পের কথা বলা যেতে পারে। রাজমহিষী এক স্ত্রী-মোষ। তাকে গান শুনিয়ে খাওয়ানো, তারপর রাজমহিষীর মেডেল জেতা একটি মনুষ্যেতর প্রাণীকে মানবায়িত করে তোলে। আবার তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'কালাপাহাড়' নামক গল্পে কৃষক রাংলালের মোষের প্রতি বাৎসল্য স্নেহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কুম্ভকর্ণ ও কালপাহাড় নামক দুই মোষের বন্ধুত্ব, কুম্ভকর্ণের মৃত্যু, কালাপাহাড়ের ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া, শেষ পর্যন্ত পুলিশের গুলিতে কালাপাহাড়ের মৃত্যু এবং রাংলালের মধ্যে বিচ্ছেদ যন্ত্রণা তীব্রতর হয়ে ওঠা — গল্পটিকে নতুনমাত্রা এনে দিয়েছে। মোষকে নিয়ে গল্পরচনার আর একটি সংযোজন হলো বনফুলের 'বুধী' গল্প।

কুকুর নামক মনুষ্যেতর প্রাণীকে নিয়ে লেখা শরৎচন্দ্রের 'অতিথির স্মৃতি' গল্পটি ঈষৎ পরিমার্জিত রূপ পেয়েছে 'দেওঘরের স্মৃতি' গল্পে। আত্মকথনের ভঙ্গিতে রচিত গল্পটিতে দেখা যায় লেখক বায়ু পরিবর্তনের জন্য দেওঘরের গিয়েছেন এবং অতিথিস্বরূপ এক কুকুরের সঙ্গে সখ্য গড়ে ওঠে। লেখকের ভাষায় — 'আজ তুই আমার অতিথি'। গল্প থেকে জানা যায় মানুষ ও পশুর স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মতোই স্বাভাবিক। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কুকুরছানা' গল্পে মানুষের ভালোবাসার বিচিত্র চিত্র পাওয়া যায়। তবে বনফুলের 'বাঘার নায়ক' গল্পে পরোক্ষভাবে কুকুরের প্রসঙ্গ এসেছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'জনি ও টনি' গল্পটিতে দুই কুকুর শুধু চরিত্র হিসাবে নয়, বরং মানুষের সামাজিক অবস্থান, নৈতিক সংকট ও সম্পর্কের প্রতীক হিসাবে দ্যোতিত হয়েছে। কুকুরকে কেন্দ্র করে লেখা শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের 'সাপ', হুমায়ুন আহমেদের 'কুকুর', সমরেশ বসুর 'বাহার', বাণী বসুর 'মাহভাদর' গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন। গল্পগুলি পাঠে জানা যায় কুকুর কেবল প্রভুর অনুসারী প্রভুভক্ত প্রাণী নয়, বরং তারা অনুভূতি ও সংবেদনশীল প্রাণী হিসাবে উপস্থিত।

সাপকে উদ্দীপন বিভাব করে লেখা গল্পগুলি হলো — কাজী নজরুল ইসলামের 'পদ্মগোখরা', তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নারী ও নাগিনী, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'বাস্তুসাপ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিড়াল, বানর, হনুমান, শেয়াল, বাঘকে নিয়ে গল্পকারের গল্প লিখেছেন।

© Santiniketan Sahityapath

তবে শুধু মনুষ্যেতর প্রাণীরা ছোটগল্পের অবয়বেই উঠে আসেনি। বরং উপন্যাসেও আছে তাদের সদর্প পদক্ষেপ। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে নলিনী বেরার 'ফুলকুসুমা' উপন্যাস। ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসটিতে মানব ও মানবেতর প্রাণীর সহাবস্থানকে এক আশ্চর্য শিল্পরূপ দান করেছেন। উপন্যাসটিতে ঈশ্বর-নিভাননীর দাম্পত্যজীবনে স্থান করে নিয়েছে একটি গরুর বাছুর। এটিকে কেন্দ্র করে স্বামী-স্ত্রীর ভিন্নতা ও কলহ যা লেখকের ভাষায় ''গোবৎস্য কলহ''। দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈশ্বর এঁড়ে বাছুরটিকে বিক্রি করতে চায়, আর নিভাননী সন্তানের মতো আঁকড়ে ধরতে চায়। শেষ পর্যন্ত তাদের দাম্পত্যজীবন শেষ হয়। নিভাননী বাছুরটিকে নিয়ে পথে ধরে এগিয়ে চলে। উপন্যাসটিতে মানবজীবন ও মানবচরিত্র রচনায় আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ঔপন্যাসিক।

আফসার আমেদ 'হলুদ পাখির কিস্‌সা' (১৯৯৫) উপন্যাসে হলুদ পাখি নামে এক মানবেতর প্রাণীকে এনেছেন। ধর্মপ্রাণ নাসিম ও তার সুন্দরী স্ত্রী জাহানের দাম্পত্য প্রেম ও তালাকপ্রাপ্ত হওয়া এবং সেখান থেকে মুক্তির পথ হয়ে দেখা দিয়েছে হলুদ পাখি। হলুদ পাখি হয়ে উঠেছে জাহান ও নাসিমের সম্পর্কের আধার। তালাকের মতো ঘৃণ্য ব্যবস্থার সঙ্গে হলুদ পাখির সম্পর্ককে কথাকার যে অভিনব আঙ্গিকে পরিবেশন করেছেন তা এক কথায় অভিনব।

বনফুলের 'ডানা' উপন্যাসটিতেও পাখিদের বিশাল জগৎ ও মনুষ্যেতর প্রাণীর ভিড়ে ঠাসা। মুক্ত আকাশে উড়ে যাওয়া পাখি এবং তাদের বিচরণভূমি অরণ্য নিয়েই 'ডানা' উপন্যাস। কাহিনির বিশালতা ও ব্যপ্তি যদি হয় মহাকাব্যের লক্ষণ, তবে 'ডানা' উপন্যাসে আমরা সেই মহাকাব্যিকতার ছোঁয়া পেতে পারি। মুক্ত আকাশে বিচরণশীল পাখিদের নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হলেও পক্ষীতত্ত্বের পথে অবগাহন করতে করতে মানবজীবনের জটিলতর রূপ ও তার বিচিত্র প্রকাশকে আমরা দেখতে পাই। আর সেই বিচিত্রতার মধ্যে ডানা নামী নারীচরিত্রটির মুক্তি সন্ধানের যাত্রাই হয়ে উঠেছে উপন্যাসটির প্রধান রসতত্ত্ব।

বাংলা কথা-আখ্যানে 'না-মানুষের' আখ্যান রচনায় ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায় — এঁদের নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়। এঁরা কেউ কেউ কল্প বা ফ্যান্টাসি জগৎ নির্মাণে মনুষ্যেতর প্রাণীদের এনেছেন। আবার সোমেন চন্দের 'ইঁদুর' গল্পটি প্রতীকী তাৎপর্যে নতুন মাত্রা পেয়েছে। বনফুলের 'নিমগাছ' গল্পে নিমগাছটি ও সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' গল্পে গাড়িটি সজীব সত্তায় উপস্থিতি যদিও তারা মনুষ্যেতর প্রাণী নয়। কথা-আখ্যানে পশু-পাখিরা কখনো কেন্দ্রীয় চরিত্র, কখনো বা পার্শ্বচরিত্র। আবার বিনির্মাণে তারা কখনো আবেগ ও সমাজ সমালোচনার অংশ। কখনো বা মনুষ্যেতর প্রাণী রূপক ও প্রতীকের মধ্য দিয়ে দারিদ্র্য, অবহেলা, ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রান্তিক মানুষের প্রতিনিধি। বাংলা কথা-আখ্যানে মনুষ্যেতর প্রাণীর কথকতা বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে সন্দেহ নেই।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। দিব্যজ্যোতি মজুমদার, 'লোককথার ঐতিহ্য', পুস্তক বিপণি, ১৯৮৬
২। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০০২
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গল্পগুচ্ছ', বিশ্বভারতী, ১৯৫৭
৪। বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, 'বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৮
৫। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ছোটগল্প সমগ্র', মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৫০
৬। শ্রাবণী পাল, 'বর্ণময় বনফুল', অক্ষর প্রকাশনী, ২০১৫
৭। নলিনী বেরা, 'ফুলকুসুমা', করুণা প্রিন্টার্স, প্রথম করুণা সংস্করণ, বইমেলা, ২০০৭
৮। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প', বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৯৮৫

—

© Santiniketan Sahityapath